প্রথম অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সাধারণ পরিচয়

প্রথম অধ্যায়
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সাধারণ পরিচয়

ক. ভৌগোলিক রূপরেখা ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ভৌগোলিক রূপরেখা বলতে আমরা বুঝি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দুটি জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এই জেলাদ্বয় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলাদ্বয়ের উত্তরে বাংলাদেশের কিয়দংশ এবং দার্জিলিং জেলা পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে বিহার, দক্ষিণে মালদহ ও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা এবং দক্ষিণপূর্বে বাংলাদেশের বগুড়া জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

উত্তর দিনাজপুর জেলার District Statistical Hand Book -এর তথ্য অনুসারে জানা যায় উত্তর দিনাজপুর জেলাটি ভৌগোলিক দিক থেকে ২৬°৩৫´১৫´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৪৮´৩৭´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১]

আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার District Statistical Hand Book -এর তথ্য অনুযায়ী জানা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাটি ভৌগোলিক দিক থেকে ২৫°১০´৫৫´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৯°০´৩০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।[২]

আয়তন ঃ

১৯৪৭ সাল থেকে অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আয়তনের একাধিকবার পরিবর্তন হয়েছে। জেলাদ্বয়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বিষয়টিও এসে যায়। কারণ জেলাদ্বয়ের আয়তন তথা জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলে জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রটিও প্রসারিত হয়।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে উত্তর দিনাজপুর জেলার আয়তন ৩,১৪০ বর্গ কিলোমিটার।[৩] আবার ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আয়তন ২,২১৯ বর্গ কিলোমিটার।[৪]

প্রাকৃতিক পরিচয় ঃ

এই জেলাদ্বয়ে যেমন কোনো পাহাড় বা পর্বত নেই, তেমনি কোনো গভীর অরণ্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে এই জেলাদ্বয়ে রয়েছে বিভিন্ন রকমের গাছ। যেমন, আম, জাম, কাঁঠাল, শিমূল, নিম, গামারি, পাকুর ইত্যাদি। জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিতে এই গাছগুলোর প্রভাব অপরিসীম। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিতে একটি বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। যেমন প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার আশঙ্কা হলে জেলাদ্বয়ের লোকসমাজ বাড়ির উঠোনে জমা করা গোবরের মধ্যে লাঙল ঢুকিয়ে দেয়। লোক-বিশ্বাস এর ফলে বৃষ্টি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে গ্রামে যখন প্রবল খরা হয়, বৃষ্টির লেশ মাত্র থাকে না, তখন লোকসমাজের দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের নারীরা জলের জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট গানের মাধ্যমে সকরুণ প্রার্থনা জানায়। এরই নাম জলমাঙা। লোকসমাজের এই নারীরা মনে করে তাঁদের কৃত্য আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টির ধারা বইয়ে দেবেন। জেলাদ্বয়ের মাটি সাধারণত দোঁয়াশ ও পলিযুক্ত। এই মাটিতে জলবায়ুর গুণে বিভিন্ন রকমের ফসল উৎপন্ন হয়। লোকসমাজের বেশির ভাগ মানুষই কৃষিজীবী। তবে কৃষিজীবী ছাড়াও মৎসজীবী সহ বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষজনও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং জমি থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলও যে জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে একথা বলা যেতে পারে। যেমন - জেলাদ্বয়ের জমিতে উৎপাদিত প্রধান ফসল হল ধান। লোকসমাজের ভাষায় যে ধান কাটে তাকে ধানুয়া বলে। লোকসমাজে এই ধানকে কেন্দ্র করে যে গান রচিত হয়েছে তা হল —

ধান কাটে ধানুয়া ভাইরে
পড়িয়া থাকে ন্যাড়া
দেহের মানুষ চলিয়া গেলে
গনধায় সরা সরা।

লোকসমাজের বিশ্বাস বাড়িতে ধান সিদ্ধ করার কিছুদিন পর যদি সিদ্ধ ধান থেকে ট্যাগ বের হয় তাহলে বাড়িতে লক্ষ্মীর গান দিতে হয়। লোকসমাজের ভাষায় একে বলে নক্ষ্মীয়ালা গান। এই গান বাড়িতে গায়েন দিয়ে পরিবেশন না করালে বাড়ির অমঙ্গল হয় বলে লোকসমাজ মনে করে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নদনদী ঃ

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষের সঙ্গে নদনদীর একটি গভীর সম্পর্ক আছে। এই নদনদীর তীরে চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষিনির্ভর লোকায়ত জীবন গড়ে উঠেছিল। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নদনদীকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এছাড়া জীবন যাত্রার নিরিখে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নদনদীর ভূমিকা তো আছেই। তাই নদনদী এক্ষেত্রে ধর্মীয় জীবনযাত্রারও প্রতীক। উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রধান নদনদীগুলোর নাম হল — মহানন্দা, নাগর, কুলিক, টাঙ্গন ইত্যাদি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রধান নদনদীগুলোর নাম পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, ইছামতী, যমুনা ইত্যাদি।

উত্তর দিনাজপুর জেলার নদনদীগুলোর পরিচয় —

মহানন্দা ঃ

"মহাভারতে নন্দা বা অপরানন্দা নামে এই নদী খ্যাত; যেমন —

"নন্দাথপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্।
মহানদীং গয়াঞ্চৈব গঙ্গামপি চ ভারত।।"

কাজেই মহানন্দা নিঃসন্দেহে প্রাচীন ও লোকবিশ্রুত নদী। দার্জিলিং জেলায় এর উৎপত্তি স্থলে নদীটি মহানন্দা নামে পরিচিত। উদ্ধৃত শ্লোকাংশে মহানদীর নামও উল্লিখিত। পুরাণের এই নন্দা/অপরনন্দা/মহানদী বর্তমানে মহানন্দা নামে খ্যাত। এই নদী পশ্চিম দিনাজপুর (বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলার উত্তর সীমায় কয়েক মাইল বয়ে গিয়ে ক্রমশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার ইটাহার থানা (বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর) এলাকায় গোড়াহার ও তারাপুর (বর্তমান নাম) ঘাটের সংযোগস্থল দিয়ে এই জেলায় পুনঃ প্রবেশ করেছে। তারপর ক্রমশ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এই জেলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমা নিরূপিত করে আরও দক্ষিণে মালদহ জেলায় গিয়ে প্রবেশ করেছে।

নাগর ঃ

নদীটির উৎস স্থান বর্তমান বাংলাদেশভুক্ত দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশে। উৎস থেকে নদীটি দক্ষিণ পশ্চিমে ইসলামপুর মহকুমার (উত্তর দিনাজপুর) অন্তর্গত সাঁতালিয়া, গোয়ালগছ প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরে (বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলায়) প্রবেশ করে ক্রমশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং করণদীঘি থানার ও রায়গঞ্জ থানার মধ্যবর্তী

সীমারেখা সৃষ্টি করে আরও পশ্চিমে গিয়ে বিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর (বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলার) পশ্চিম প্রান্তিক সীমানা বরাবর বেশ কয়েক মাইল বয়ে গিয়ে শেষে পূর্বোল্লিখিত গোড়াহার (ইটাহার থানা ভুক্ত) অঞ্চলে গিয়ে মহানন্দা নদীর সহিত মিলিত হয়েছে ও নিজস্ব গতিপথের সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

কুলিক ঃ

বর্তমান বাংলাদেশভুক্ত দিনাজপুর জেলা থেকে উদ্ভূত কুলিক নদী রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল এলাকা দিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করে ক্রমশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে রায়গঞ্জ শহরের পশ্চিম ধার দিয়ে ৭/৮ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়ে রায়গঞ্জ থানা ভুক্ত বিষাহার এবং ইটাহার থানা ভুক্ত গোড়াহার নামক গ্রামের সংযোগস্থলে নাগর নদীর সহিত মিলিত হয়েছে ও নিজের গতিপথের শেষ সীমা টেনেছে।

টাঙ্গন ঃ

টাঙ্গন নদী বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশ থেকে উদ্ভূত হয়ে পীরগঞ্জ ও বোচাগঞ্জ হয়ে তৎসংলগ্ন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলার) কালিয়াগঞ্জ থানার সংযোগকারী সীমানা দিয়ে প্রবেশ করে ক্রমশ (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার) কুশমণ্ডি ও বংশীহারী থানার মধ্য দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে।"[৫]

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নদনদীগুলোর পরিচয় —

পুনর্ভবা ঃ

"পুনর্ভবা (অপুনর্ভবা) এর গতিপথ বাংলাদেশভুক্ত দিনাজপুর থেকে বয়ে এসে পশ্চিম দিনাজপুরের (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার) গঙ্গারামপুর থানার উত্তর সীমানা দিয়ে এই জেলায় ঢুকে ক্রমশ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কিছুটা স্থানে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার) মধ্যবর্তী একটি সীমারেখা সৃষ্টি করেছে এবং আরও দক্ষিণ পূর্বে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পৌরাণিক যুগের কোটিবর্ষ শহর নামান্তরে ঐতিহাসিক যুগের দেবকোট বা বর্তমান কালে পরিচিত বাণগড় পুনর্ভবা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য থেকে জানা যায় তৎকালে অপুনর্ভবা বরেন্দ্রভূমির মধ্যস্থল দিয়ে প্রবাহিত হত।

আত্রেয়ী ঃ

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার) বিখ্যাত নদী আত্রেয়ী/আত্রাই বর্তমান বাংলাদেশ থেকে এসে কুমারগঞ্জ থানার (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) উত্তর সীমানা দিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করেছে। ব্যাস - মহাভারতের সভাপর্বে নারদ কর্তৃক যুধিষ্টিরের নিকট যে সমস্ত বিখ্যাত নদীর বিবৃতি রয়েছে তার মধ্যে করতোয়া ও আত্রেয়ীর নাম লক্ষণীয় —

সরর্যু বারবত্যা চ লাঙ্গলী চ সরিদ্বরা।
করতোয়া তথাত্রেয়ী লৌহিত্যশ্চ মহানদঃ।।

কুমারগঞ্জ থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর) সোজা গতিপথে নদীটি বয়ে চলেছে। আর এই স্থান দুটিও আত্রাইয়ের তীরবর্তী। এই সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্থ আত্রাই নদী কেবল মাত্র বর্ষাকালেই জলে পরিপূর্ণ হয়। ক্রমশ আত্রাই ও পুনর্ভবা নদীগর্ভ বাহিত মাটি ও পলিধারা ভরাট হয়ে চলেছে।

ইছামতী ঃ

ইছামতী নামক বাংলাদেশ থেকে আগত নদীটি কুমারগঞ্জ (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর) থানা অঞ্চল দিয়ে আত্রাই এর সঙ্গে আট মাইল সমান্তরাল ব্যবধান রেখে প্রবাহিত হয়ে শেষে রাধানগরে গিয়ে আত্রাইয়ের সঙ্গেই মিশে গেছে।

যমুনা ঃ

যমুনা নদী হিলি থানার (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর) উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে এই জেলায় এসে হিলি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের মত প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ঢুকেছে।"[৬]

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের এই নদনদীগুলির কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা ছাড়াও জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। আবার উত্তর দিনাজপুর জেলার ছোট ছোট নদী যেমন, কাঞ্চন, গামারী, সুই, শ্রীমতী এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কাসিয়াডাঙি, তুলাই, মান ইত্যাদি ছোট ছোট নদীগুলির কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা ছাড়াও লোকজীবনের লোকসংস্কৃতির উপর এই নদীগুলির প্রভাব রয়েছে।

এছাড়াও বহু প্রাচীনকাল থেকেই খননকৃত একাধিক বিখ্যাত পুস্করিণী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই দিঘিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য করণদিঘি,

বালিয়াদিঘি, ফকির দিঘি, দীপ রাজার দিঘি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য দিঘিগুলো হল মহীপাল দিঘি, কাল দিঘি, ধলদিঘি, তপন দিঘি, প্রাণসাগর ইত্যাদি। সেচ ও পানীয় জলের প্রয়োজনে প্রাচীনকাল থেকেই এই দিঘিগুলি খনন করা হলেও জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিতে এই দিঘিগুলির তাৎপর্যবাহী ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না।

____________****____________

খ. ঐতিহাসিক পরিচয়

দিনাজপুর নামকরণের অন্বেষণ ঃ

বাংলার ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী ধরে পরিচিত জেলার নাম দিনাজপুর। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দিনাজপুর একটি প্রাচীন জনপদ। এই দিনাজপুরের নামকরণ সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলেছেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ারে এফ. ডব্লিউ. স্ট্রং সাহেব লিখেছেন — "Dinajpur is said to signify the abode of beggars and is identical with Dynwaj, a Raja of which, Gonesh, usurped the government of Gour. The name appears originally to have applied more particularly to the locality in which the present Rajbari is situated and a possible explanation of it may be that some forgotten prince, Dinaj or Dinwaj, was the original founder of the Dinajpur family and gave his name to the site."[৭]

অর্থাৎ দিনাজপুরকে ভিক্ষুকদের আশ্রয়স্থান বলে চিহ্নিত করা হয় এবং এই দিনাজপুর নামটি দিনওয়াজের সঙ্গে অভিন্ন। সেখানকার রাজা গণেশ গৌড়ের শাসন ক্ষমতা অন্যায় ভাবে দখল করেছিলেন। বর্তমান রাজবাড়ি যেখানে অবস্থিত বিশেষ করে সেই স্থান সম্পর্কে এই নামটি মূলতঃ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এই কথার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে দিনাজ বা দিনওয়াজ নামে কোনো বিস্মৃত রাজকুমার দিনাজপুর রাজপরিবারের মূল প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নাম অনুসারে এই স্থানটির নামকরণ হয়েছে।

আবার ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে দিনাজপুরের নামকরণ সম্পর্কে বলেছেন, ''বর্দ্ধন কুঠীর রাজার উত্তরবাটীর কর্মচারী দেবকীনন্দন ঘোষের পুত্র হরিরাম ঘোষ গণেশের দাসী গর্ভজাতা কন্যাকে বিবাহ করেন। গণেশ, ইঁহাকে দিনরাজ ঘোষ নাম দেন। ইনি যদুর পেসকার হন। যদু, মুসলমান হইলে দিনরাজ বিনীত ভাবে পদত্যাগ করিতে চান। যদু অসন্তুষ্ট না হইয়া দিনরাজকে পাব্বত্য জাতির উপদ্রব নিবারণার্থ উত্তর বাঙ্গালায় একটি বিষয় দেন। দিনরাজ যে স্থানে বাস করেন, তাহার দিনাজপুর নাম হয়। এই দিনরাজপুর শব্দ হইতে দিনাজপুর নাম হয়।''[৮]

দিনাজপুর জেলার বিভক্তকরণ ঃ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তকরণের সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাংলার ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী ধরে পরিচিত দিনাজপুর জেলাও দ্বিখণ্ডিত হয়।

এই জেলার পূর্বাংশ পড়ল তৎকালীন নবজাত পূর্বপাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশে) এবং পশ্চিমাংশ ভারত রাষ্ট্রভুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধীন একটি নতুন জেলা পশ্চিম দিনাজপুর নামে পরিচিতি লাভ করে।

আবার ১৯৯২ সালের পয়লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পরিণত হয়।

The Calcutta Gazette

Gazette Notification No. 177 L.R.

6 M - 7/92

সুজলা-সুফলা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন বিজড়িত নানা কাহিনি এই জেলাদ্বয়ে ছড়িয়ে আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও নানা কিংবদন্তি যেমন আছে তেমনি জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা স্মৃতিও রয়েছে। এই জেলাদ্বয়ে প্রাচীন যুগে যেমন মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন রাজারা রাজত্ব করে নানা কীর্তি কাহিনি রচনা করেছে তেমনি মধ্যযুগে মুসলমান নবাবেরা তাঁদের শৌর্য-বীর্যের মাধ্যমে রাজত্ব করে স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে গেছে। এছাড়া আধুনিক যুগেও দিনাজপুরের রাজবংশ নানা মহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গৌরব গাঁথা রচনা করেছে।

যে দিনাজপুর জেলা বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়েছে তার ইতিহাস হল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুণ্ড্র জাতির আবাস ভূমি ছিল এই পুণ্ড্র রাজ্য। ধনঞ্জয় রায়ের 'দিনাজপুর জেলার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় — "ক্ষত্রিয়রাজ বলি ছিলেন নিঃসন্তান। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার সঙ্গে দীর্ঘতমা ঋষির মিলন হয়। ফলে, সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা নিজের নিজের নামে পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের অধীশ্বর হন পুণ্ড্র এবং এই দেশ পুণ্ড্রদেশ নামে পরিচিতি লাভ করে।"[৯]

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এই জেলাদ্বয়ে পড়েছিল। মৌর্যযুগের বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্র শাসন থেকে বোঝা যায় এই জেলাদ্বয়ের কিছু কিছু স্থান যেমন বাণগড় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীন ছিল। হরিসেন রচিত 'বৃহৎকথাকোশ' গ্রন্থানুসারে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জৈনগুরু জৈন কল্পসূত্র প্রণেতা ভদ্রবাহু পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন কোটীবর্ষের একজন ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন। এই প্রাচীন কোটীবর্ষ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর নামক স্থান। সুতরাং বলা যায়

গঙ্গারামপুর ছিল ভদ্রবাহুর জন্মভূমি। আবার এই প্রাচীন কোটীবর্ষ বলিরাজার পুত্র বাণ ও ঊষা-অনিরুদ্ধের পৌরাণিক উপকথায় বিজড়িত। এই বাণগড় হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্ভুক্ত। এখনও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার ফতেপুর নামক স্থানের একটি প্রাচীন রাস্তা ঊষাহরণ রোড নামে পরিচিত। আবার এই জেলাদ্বয়ে গুপ্ত যুগের সময় চিহ্নিত এমন কয়েকটি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে যা থেকে অনুমান হয় এই জেলাদ্বয়ের কিছু কিছু অঞ্চল গুপ্ত রাজগণের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় — "মৌর্যযুগের বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে বোঝা যায় পশ্চিম দিনাজপুর (বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলার কিছু কিছু স্থান বর্তমান বাণগড় বা প্রাচীন কোটীবর্ষীয়, বর্তমান পঞ্চনগর বা প্রাচীন 'পঞ্চনগরী বিষয়' প্রভৃতি বৃহত্তর পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীন ছিল। হিলির নিকট বৈগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে 'কোটীবর্ষ বিষয়' ও 'পঞ্চনগরী বিষয়ের তৎকালীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আবার হরিসেনের বৃহৎকথাকোষ থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জৈনগুরু জৈন কল্পসূত্র প্রণেতা ভদ্রবাহু পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন কোটীবর্ষের একজন ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন। ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাসার সমকালে জৈনদের যে চারটি পীঠস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান তিনটি হল তাম্রলিপ্তীয়, কোটীবর্ষীয় এবং পুণ্ড্রবর্ধনীয়। এ থেকে প্রাচীন ইতিহাসে কোটীবর্ষের বিশেষ গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হয়।

এই বিখ্যাত কোটীবর্ষ নগরীই বাংলার সুলতানী আমলে দেবকোট নগর এবং বর্তমান কালে গঙ্গারামপুর তথা বাণগড় নামে সমধিক পরিচিত। বাণগড় সম্পর্কে পৌরাণিক উপকথা হল —

অতীতকালে বলিরাজার পুত্র বাণরাজা ছিলেন এই বাণগড়ের অধিপতি। তাঁর কন্যা ঊষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করে নিয়ে যান। এই বিষয় নিয়ে বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং দীর্ঘ রণের পর বাণরাজা পরাজিত ও নিহত হন। ঊষাহরণের সেই সূত্র ধরে কুশমণ্ডি থানা এলাকায় এখনও একটি প্রাচীন রাস্তা ঊষাহরণ রোড নামে পরিচিত।

বর্তমান বাংলাদেশভুক্ত ফুলবাড়ি থানার এলাকাধীন দামোদরপুরে প্রাপ্ত পাঁচটি তাম্রশাসনের মধ্যে দুটি প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ের, দুটি বুদ্ধগুপ্তের সময়ের এবং পঞ্চমটি ২২৪ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন গুপ্তরাজার সময়ের। আর পশ্চিম দিনাজপুর ভুক্ত হিলি থানার অধীন বৈগ্রামে পুষ্করিণী খননকালে প্রাপ্ত ১২৮ গুপ্তাব্দ চিহ্নিত তাম্রশাসন ভূমি বিক্রয় বিষয়ক

এবং এতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত 'কোটীবর্ষ বিষয়' এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে।''[১০]

মৌর্য ও গুপ্তযুগের পর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু কিছু অঞ্চল পাল ও সেন যুগের নানা স্মৃতি এখনও বহন করছে। এই জেলাদ্বয়ের অনেক স্থান নাম, দিঘির নাম, খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের নাম প্রভৃতি পাল রাজাদের নামানুসারে হয়েছে। যেমন, স্থান নামের দিক থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার মহীপুর গ্রাম, খাদ্যশস্য হিসেবে মহীপাল ধান এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার মহীনগর গ্রাম, কুশমণ্ডি থানার মহীপাল দিঘি, তপন থানার মনহলি গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলিপির মাধ্যমে রাজা মদন পালের স্মৃতি ইত্যাদি পাল রাজাদের অতীত কাহিনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা স্মরণ করা যেতে পারে — ''দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন পাল রাজবংশ দুর্দশা ও অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল তখন দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করেন (আঃ ৯৮৮ খ্রীঃ)। তাঁহার অর্ধশতাব্দী ব্যাপী রাজত্বকালে পালবংশের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইয়াছিল। তিনি বাংলার বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও পুনরায় পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যে অতুল কীর্তি রচনা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাংলাদেশ ধর্মপাল ও দেব পালের নাম ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ধান ভাঙতে মহীপালের গীত প্রভৃতি লৌকিক প্রবাদ, দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি ও মুর্শিদাবাদের সাগর দিঘি এবং মুর্শিদাবাদ জিলার মহীপাল, বগুড়া জিলার মহীপুর, দিনাজপুর জিলার মহীসন্তোষ ও রঙপুর জিলার মহীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান আজিও মহীপালের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।''[১১]

মহীপাল জনমানসে যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন তার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত দেশিয়া-পলিয়া সমাজে প্রচলিত একটি লৌকিক ছড়ায় —

১. মহীপাল দিঘির
নাম্বা নল
তাহায় মজাম
নাগায় কল।

(তথ্যদাতা ঃ নিমাই সরকার (৪৪), গ্রাম - দুর্গাপুর,
থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

অর্থ ঃ মহীপাল দিঘিতে লম্বা লম্বা নল গাছ ছিল। সরু ও লম্বা বিশিষ্ট এই গাছটিকে আঠারো থেকে কুড়ি ইঞ্চি করে কেটে কেটে তাতে বর্শী লাগিয়ে মাছ ধরা হত। মজাম নামে এক ব্যক্তি এই

মাছ ধরতেন।

আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার তপন দিঘি লক্ষ্মণ সেনের স্মৃতি বহন করছে। সুতরাং বলা যেতে পারে পাল ও সেন যুগের নানা স্মৃতি এখনো জেলাদ্বয়ের কিছু কিছু অঞ্চলে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

এরপর বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সুলতানী যুগের সূত্রপাত হয়। সুলতানী যুগে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল। যেমন - দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বা তদানীন্তন দেবকোট নামক স্থানে বক্তিয়ার খিলজী সামরিক শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানেই অসুস্থ অবস্থায় অনুচর আলী মর্দানের দ্বারা নিহত হন। লোকশ্রুতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার পীরপাল গ্রামে যে সমাধি স্থানটি রয়েছে সেটি বক্তিয়ার খিলজীর সমাধি।

এরপর লখনৌতির সুলতান হলেন আলী মর্দান। আলী মর্দানের পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। পরবর্তীকালে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার পর রাজ্য বিস্তারে মন দেন। ইলিয়াস শাহের যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত একডালা দুর্গ গড়ে উঠেছিল বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার শ্রীমতী ও বালিয়া নদীর আবেষ্টনীর মধ্যে। বর্তমানে একডালা নামক দুর্গটির কিছু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার একডালা নামক গ্রামে।

আবার ইলিয়াসশাহী বংশের অবসানে একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশ যে কয়েক বছর বাংলায় শাসন করেছিলেন সেই রাজা গণেশও এই জেলাদ্বয়ের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অধিপতি হন সুলতান হুসেন শাহ। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় — "এখনও রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মৌজা মিরুয়াল-এ (আর. এল. নং - ১৭৪) হুসেন শাহের স্মৃতিবাহী ফকির দীঘি রয়েছে।"[১২]

হুসেন শাহের পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভূমি আকবরের সাম্রাজ্যাধীন হয়। আকবর যে তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরটি সুবায় ভাগ করেছিলেন তদানীন্তন দিনাজপুর জেলার অধীনে ছিল ছয়টি সরকার।

এরপর দিনাজপুরের রাজবংশ সম্পর্কে যে কাহিনীটি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ —

রাজা শুকদেবকে দিনাজপুর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ এবং প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ এই জমিদারি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। প্রাণনাথের

সুকীর্তির নিদর্শনরূপে প্রাণসাগর দিঘির কথা বলা যেতে পারে। এই প্রাণসাগর দিঘিটি বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার প্রাণসাগর নামক স্থানে লক্ষ্য করা যায়। রামনাথ রাজা হয়ে রামসাগর দিঘি খনন করান। রামনাথের মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ উত্তরাধিকারী হন। অপুত্রক অবস্থায় বৈদ্যনাথ মারা গেলে বিধবা রানি সরস্বতী রাধানাথ নামক যুবককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গোবিন্দনাথ কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে ইহলোক ত্যাগ করেন। অপুত্রক অবস্থায় তারকনাথ মারা গেলে তাঁর বিধবা রানি গিরিজানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই গিরিজানাথের পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুরের সর্বশেষ রাজা। এ বিষয়ে Jatindra Chandra Sengupta সম্পাদিত 'West Bengal District Gazetteers' West Dinajpur - গ্রন্থে উল্লেখ আছে — " ওয়েস্ট ম্যাকট অনুসারে জানা যায় দিনাজপুরের বেশ কিছু জায়গা সে সময় কালী ও কৃষ্ণের পূজারী বলশালী এক সাধক ব্রহ্মচারীর ছিল। অঞ্চলটি পঞ্জরা সরকারাধীন ছিল। অন্তিমকালে ঐ ব্রহ্মচারী শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী নামে এক শিষ্যকে ঐ সম্পত্তি দান করে যান। আবার শ্রীমন্ত চৌধুরী অপুত্রক হওয়ার ফলে দৌহিত্র শুকদেব ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং সম্পত্তির কলেবর বৃদ্ধি পায়। সেই সম্পত্তির মধ্য ও উত্তরাংশ পঞ্জরা সরকারাধীন, পশ্চিমাংশ তাজপুর সরকারাধীন এবং বংশীহারী ও গঙ্গারামপুরের কিছু অংশ জনতাবাদ সরকারাধীন ছিল।

১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে শুকদেব রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি নিজেকে শক্তিশালী রাজা রূপে তুলে ধরেছিলেন। প্রাণসাগর দিঘিটি তিনি খনন করিয়েছিলেন। অপুত্রক হওয়ায় তিনি রামনাথ নামে এক আত্মীয়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামনাথ রাজা হয়ে রামসাগর নামক দিঘি খনন করান। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রামনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ উত্তরাধিকারী হন।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় রাজা বৈদ্যনাথ মারা যান। এরপর বিধবা রানি সরস্বতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যথাযোগ্য মোহর প্রদান করে রাধানাথ নামক এক যুবককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করে মৃত রাজা বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতির ব্রিটিশ সনদ অর্জন করেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাধানাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এর কিছুদিন পরে কোম্পানীর বিপুল খাজনা পরিশোধের বিষয়ে রাজ্যের কিছু অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে রাধানাথের মৃত্যু হয়। তাঁর বিধবা রানি তখন গোবিন্দনাথ নামক এক তরুণকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দনাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। কনিষ্ঠ পুত্র তারানাথকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তারকনাথ

মারা যান। এরপর তাঁর বিধবা রানি গিরিজানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গিরিজানাথের পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুরের সর্বশেষ রাজা। তাঁর সময়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ফলে দিনাজপুর দ্বিখণ্ডিত হয়।"[১৩]

ফলস্বরূপ ভারতরাষ্ট্রভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের একটি নতুন জেলা রূপে পশ্চিম দিনাজপুরের সৃষ্টি হয়। আবার ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পরিণত হয়।

****

NBU, DARJEELING · LIBRARY ·
241116
18 DEC 2012

গ. জনবিন্যাস

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী জনমণ্ডলী প্রধানত হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন সমাজ দ্বারা গঠিত। এই জেলাদ্বয়ে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা হলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, সাহা, নমঃশুদ্র ইত্যাদি এবং সরকার, দেবশর্মা, রায়, বর্মণ, সিংহ পদবী গ্রহণকারী তপশিলি জাতিভুক্ত লোকেরা হলেন বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দেশিয়া-পলিয়া এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত লোকেরা হলেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, কুর্মি ইত্যাদি।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রধানত গোয়ালপোখর, ইসলামপুর, চোপরা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রধানত কুমারগঞ্জ, তপন ও হিলি থানা এলাকায় মুসলমান সমাজের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় দিক থেকে এঁরা ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। রমজান মাসে রোজা পালন, সবেবরাত ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন। কৃষি এঁদের প্রধান জীবিকা। কৃষিকে কেন্দ্র করে এঁদের জীবনচর্যা অতিবাহিত হয়। এছাড়া জেলাদ্বয়ে সংখ্যায় অল্প হলেও খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায় হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে বসবাস করছেন এবং জেলাদ্বয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করে চলেছেন। ফলস্বরূপ জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিতে এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে উত্তর দিনাজপুর জেলার ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা হল[১৪] —

হিন্দু	-	১২,৬৩,০০১ জন
মুসলিম	-	১১,৫৬,৫০৩ জন
খ্রিস্টান	-	১৩,১৭২ জন
শিখ	-	২৫২ জন
বৌদ্ধ	-	৩৩৫ জন
জৈন	-	১,৪০৭ জন
অন্যান্য	-	৬,০৮৮ জন
ধর্ম (অজ্ঞাত)	-	১,০৩৬ জন
মোট জনসংখ্যা	-	**২৪,৪১,৭৯৪ জন**

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা হল[১৫] —

হিন্দু	-	১১,১২,৫৭৫ জন
মুসলিম	-	৩,৬১,০৪৭ জন
খ্রিস্টান	-	২২,০৩৯ জন
শিখ	-	২১৫ জন
বৌদ্ধ	-	১৭৫ জন
জৈন	-	২৩৫ জন
অন্যান্য	-	৬,০২৮ জন
ধর্ম (অজ্ঞাত)	-	৮৬৪ জন
মোট জনসংখ্যা	-	**১৫,০৩,১৭৮ জন**

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। ফলস্বরূপ তাঁদের ধর্ম বিভিন্ন রকমের। কিন্তু ধর্ম স্বতন্ত্র হলেও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। প্রায় প্রতিটি গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট পাড়া বা এলাকা লক্ষ্য করা যায়। যেমন — দেশিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন দেশিয়া পাড়ায়, পলিয়ারা থাকেন পলিয়া পাড়ায়, সাঁওতালরা থাকেন সাঁওতাল পাড়ায়, মুসলমানরা থাকেন মিঞা পাড়ায়। তবে পাড়া আলাদা হলেও অনেকগুলো পাড়াযুক্ত সমগ্র গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা পারস্পরিক সামাজিক ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যেমন — গ্রামের হিন্দু সমাজের গ্রামঠাকুরের পুজো, কালী পুজো, বিষহরা গান, বিভিন্ন রকমের ব্রত যেমন ধরম -ব, অথাই-পথাই -ব এবং বিভিন্ন রকম মেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যোগদান করেন। আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের পীরের পুজো, মহরমের মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হিন্দু সমাজ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর গীর্জা প্রাঙ্গণে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনে সেই স্থান মিলন মেলায় পরিণত হয়। এই মিলন মেলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নিদর্শন।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই বসবাস করেন গ্রামে। এঁদের জীবিকা মূলত কৃষিকাজ। কৃষিকাজ ছাড়া অনেকে আবার ধানকল, ইটভাঁটা, রাজমিস্ত্রির কাজ, মাছের ব্যবসা, মাটি দিয়ে শিল্পকর্ম, শোলা নিয়ে শিল্পকর্ম, যানবাহন চালনা ইত্যাদি নানা রকম জীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিম দিনাজপুর (বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার) তপশিলি জাতির তালিকা দেওয়া হল[১৬] —

বাগদি বা দুবে, বারুই, বেদিয়া, বেলদার, ভোগতী, ভুঁইমালি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, বিন্দ, চামার, ধামাই (নেপালি), ধোবা বা ধোবী, দোয়াই, ডোম বা ধানগাড, দোসাধ বা দুসাধ, ঘাসি, গোনরি, হাঁড়ি, হালালখোর, জালিয়া কৈবর্ত, ঝালো মালো বা মালো, কাদের, কামি (নেপালি), কাওড়া, কৌর, কেওট বা কেয়ট, খারিয়া, খাতিক, কোচ, কালোয়ার (কোমভের), লোহার, মাহার, মাল্লা, মালহা, মেথর, মুশহর, নমঃশূদ্র, নট, নুনিয়া, পলিয়া, পাশি, পান বা সাওয়াসি, পাটনি, পোদ বা পুণ্ড্র, রাজবংশী, রাজোয়ার, সরকি (নেপালি), সুরি, তিয়র, তুরি।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিম দিনাজপুর (বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার) তপশিলি উপজাতির তালিকা দেওয়া হল[১৭] —

অসুর, বেদিয়া, ভূমিজ, ভুটিয়া, বিরজিয়া, চেরো, চিকবরাইক, গারো, গোনদ, গোরাইট, হাজং, হো, কারমালি, খারওয়ার, কোরা, কোরওয়া, লোধা, লোহারা অথবা লোহরা, মগ, মাহালি, মালপাহাড়িয়া, মেচ, ম্রু, মুণ্ডা, নাগাসিয়া, ওরাওঁ ও পাহাড়িয়া, রাভা, সাঁওতাল, শবর।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুর জেলায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগণের তালিকা নিম্নরূপ[১৮] —

সারণি : ১

তপশিলি জাতি		পুরুষ	মহিলা	মোট
২০০১ সাল	-	৩৪৮৬৯৩	৩২৭৮৮৯	৬৭৬৫৮২
তপশিলি উপজাতি				
২০০১ সাল	-	৬৩১২৩	৬১৭৪২	১২৪৮৬৫

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগণের তালিকা নিম্নরূপ[১৯] —

সারণি : ২

তপশিলি জাতি		পুরুষ	মহিলা	মোট
২০০১ সাল	-	২২২০৬৩	২১০৫৯৭	৪৩২৬৬০
তপশিলি উপজাতি				
২০০১ সাল	-	১২২৪৪২	১১৯৮৭৫	২৪২৩১৭

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় উত্তর দিনাজপুর জেলায় তপশিলি জাতির সংখ্যা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তুলনায় বেশি। আবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় তপশিলি উপজাতির সংখ্যা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তুলনায় কম। জেলাদ্বয়ে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির বসবাসের ফলে জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপশিলি জাতির সংখ্যা বেশি। সেই তুলনায় তপশিলি উপজাতির সংখ্যা অনেক কম। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপশিলি জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দেশিয়া-পলিয়া-কোচ সম্প্রদায়ের। বর্তমানে কোচ জাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচ জাতি মিশে গেছে। শুধুমাত্র কোচ নামকরণের মধ্যেই এর পরিচয় নিহিত আছে। কিন্তু দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি এখনও নদীর স্রোতের মতো বহমান। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রত্যেকটি থানা এলাকায় এই দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন কমবেশি বসবাস করেন। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধিকরণে যাঁদের ভূমিকা অসামান্য।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বৃহত্তর জনসমষ্টি প্রধানত গ্রামবাসী। কৃষিই এঁদের প্রধান জীবিকা।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যা নিম্নরূপ[২০] —

মোট জনসংখ্যা	-	২৪,৪১,৭৯৪ জন
পুরুষ	-	১২,৫৯,৭৩৭ জন
মহিলা	-	১১,৮২,০৫৭ জন
শহরে জনসংখ্যা	-	২,৯৪,৪৪৩ জন
পুরুষ	-	১,৫৫,৫১৩ জন
মহিলা	-	১,৩৮,৯৩০ জন

গ্রামে জনসংখ্যা	-	২১,৪৭,৩৫১ জন
পুরুষ	-	১১,০৪,২২৪ জন
মহিলা	-	১০,৪৩,১২৭ জন

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যা নিম্নরূপ[২১] —

মোট জনসংখ্যা	-	১৫,০৩,১৭৮ জন
পুরুষ	-	৭,৭০,৩৩৫ জন
মহিলা	-	৭,৩২,৮৪৩ জন
শহরে জনসংখ্যা	-	১,৯৬,৮৫৪ জন
পুরুষ	-	১,০০,৫৩৯ জন
মহিলা	-	৯৬,৩১৫ জন
গ্রামে জনসংখ্যা	-	১৩,০৬,৩২৪ জন
পুরুষ	-	৬,৬৯,৭৯৬ জন
মহিলা	-	৬,৩৬,৫২৮ জন

সুতরাং ২০০১ -এ শতকরা হিসাবে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৮.৭২ শতাংশ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শতকরা হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২২.১৫ শতাংশ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উত্তর দিনাজপুর জেলায় বেশি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সেই তুলনায় কম। তবে জেলাদ্বয়ে প্রতিদিনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে চলেছে। এর ফলে জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিতে এর একটা প্রভাব পড়ে। কারণ জনসংখ্যা যত বাড়বে লোকসংস্কৃতিতে জনগণের অংশগ্রহণ তত বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

——————****——————

ঘ. লোকসমাজ

জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ। মানুষকে নিয়েই তৈরি হয়েছে সমাজ। সমাজে মানুষ একে অন্যের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বসবাস করে। তাই সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। সেই সংগ্রাম ছিল কখনও নিজের জীবন রক্ষার তাগিদে, কখনও বা সমষ্টির জীবন রক্ষার জন্যে। একদিকে তাঁরা যেমন প্রাকৃতিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে তাঁদের হিংস্র জন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। এই প্রাকৃতিক শক্তি অর্থাৎ ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, মৃত্যু সেদিনের অজ্ঞ মানুষের মনে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের জন্ম দিয়েছিল। এই আদিম মানুষেরা একদিকে যেমন ছিল অকপট, তেমনি অন্যদিকে ছিল নিরক্ষর। এইসব কথা আমরা সমাজ নৃবিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। নৃবিজ্ঞানী S.F. Nadel লিখেছেন, "The Scope of any science is to obtain and extend knowledge in social anthropology as it is commonly understood we attempt to extend our knowledge of man and society to 'Primitive' communities 'Simpler peoples' or 'preliterate' societies."[২২]

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষ বনে জঙ্গলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করত। গাছের ফলমূল ইত্যাদি যেমন তাঁরা আহার করত তেমনি শিকার পদ্ধতির মাধ্যমে পশু-প্রাণি হত্যা করে তাঁর মাংসও ভক্ষণ করত। খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের পর তাঁরা পশুপালন করতে শিখল। এরপর পশুপালন থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে কৃষিকর্মের পত্তন ঘটাল। নৃবিজ্ঞানী কার্ত্তিকচন্দ্র শাসমল লিখেছেন, "কালের অগ্রগতিতে আদিম শিকারজীবী ভবঘুরে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আরম্ভ হলো, উদয় হলো কৃষিজীবী সমাজের। প্রকৃতি নির্ভর মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির শাসন শুরু করল, তার সেই প্রাচীন অসংলগ্ন জীবনের গতিপথ গেল পাল্টে আরম্ভ হলো পরিপূর্ণ সমাজ জীবন।"[২৩]

কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাসকারী একই ভাষাভাষি ও সংস্কৃতি বহনকারী যে ঐতিহ্যবাহী জনসমাজ তাকেই বলা হয় লোকসমাজ। লোকসমাজে অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। তাঁদের বাসস্থান গ্রাম। এই কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, ধর্ম, বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছে লোকায়ত সংস্কৃতি। তাই লোকসমাজে হৃদয়ের যোগ সবচেয়ে বেশি। লোকসমাজে কৃষক, শ্রমিক ও লোকশিল্পীদের লোকায়ত সংস্কৃতিরচর্চা করার ফলে লোকায়ত সমাজ চেতনার সৃষ্টি হয়। লোকসমাজে এই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ লোকসংস্কৃতিকে

ঐতিহ্যগতভাবে ধারণ করে চলেছেন এবং পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন। এটাই লোকসমাজের নিজস্বতা।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর একটি প্রাচীন জনপদ। ইতিহাসের নানা স্রোত এই জেলাদ্বয়ের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এই জেলাদ্বয়ে রয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। তাই এই জেলাদ্বয়ে লোকসমাজের লোকায়ত সংস্কৃতিতে মিশ্রণ ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই জেলাদ্বয়ে রয়েছে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, খ্রিস্টান, মুসলিম ইত্যাদি জনগোষ্ঠী। বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত তপশিলি জাতির মানুষেরা হলেন বর্মণ, রায়, সরকার, দেবশর্মা, সিংহ ইত্যাদি উপাধি গ্রহণকারী দেশিয়া-পলিয়া এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষেরা হলেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি।

বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত তপশিলি জাতির মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। তবে কৃষিকাজ ছাড়াও অনেকে গ্রামে ঘানিতে তেল তৈরি করে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। যাঁরা লোকশিল্পী তাঁরা অবসর সময়ে কৃষিকর্ম করে জীবনের বেশিরভাগ সময়ই ঐহিত্যগত ভাবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের নিমগ্নভাবে চর্চা করে লোকসমাজে তার প্রয়োগ ঘটান। তবে অবকাশ মতো গ্রামের কৃষকেরাও লোকশিল্পীদের দলে যোগ দিয়ে লোকসংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

তপশিলি উপজাতিভুক্ত আদিবাসী সমাজেরও মূল কর্ম কৃষিকাজ। আদিবাসী সমাজে নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই কৃষিকাজ করেন। তবে কৃষিকাজ ছাড়াও অনেকে পালকি বহা, পশুপালন এবং নানা ধরনের লোকশিল্প তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই আদিবাসী সমাজ এখনও নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে বসবাস করে আসছেন। এঁদের সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠী চেতনা। আদিবাসী সমাজের একটা বড় অংশ জুড়ে এখনও রয়েছে নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা একটা সমাজকে কখনও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এই নিরক্ষরতার কারণে এখনও আদিবাসী সমাজে ডাইনি প্রথা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়নি। তাই আদিবাসী সমাজের উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় এই ডাইনি প্রথা। অন্যদিকে আদিবাসী সমাজের প্রধান উৎসব হল করম উৎসব। আশ্বিন মাসে এই উৎসবের সূচনা। এই উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসী সমাজে নৃত্য ও গীতের প্রচলন আছে। এছাড়া বিবাহসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আদিবাসী মানুষেরা আনন্দ-উৎসব করে থাকেন।

প্রাত্যহিক জীবনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাছ, ভাত, ডাল, সবজি প্রভৃতি প্রিয় খাদ্য। তবে ছোট ছোট শামুকের মাংস দিয়ে ডালের মতো রান্না করে যাকে বলে গুনজরির ডাইল, শালুক

ফুলের মূল সিদ্ধ, শিমূল আলুর সিদ্ধ ইত্যাদি তাঁদের প্রিয় খাদ্য তালিকার অতিরিক্ত সংযোজন। পোশাক পরিচ্ছদের দিক থেকে পুরুষেরা কোমর থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত এক খণ্ড ধুতি, পাঞ্জাবি পরিধান করেন। এছাড়া কাঁধে কখনও কখনও একটি গামছাও ঝুলিয়ে রাখেন। মহিলারা ছাপা শাড়ি ব্যবহার করেন। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন গ্রামে এই আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করেন। গ্রামের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিতে এঁরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর ফলে জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মুসলিম জনসমাজও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জেলাদ্বয়ে মুসলিমদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ না থাকলেও সুন্নি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত সৈয়দ, শেখ, ইসলাম, মিঞা, রহমান, সরকার, চৌধুরী, মণ্ডল প্রভৃতি পদবীধারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ পদবীধারী মানুষেরা হলেন শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক বিচারে অভিজাত। এছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য পদবীধারী মানুষের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা থাকলেও সামাজিক বিচারে তাঁরা সাধারণ মানুষ। শেখ পদবীধারী মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। একটি নস্য শেখ অপরটি শেখ। এই নস্য শেখ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও.বি.সি. তালিকাভুক্ত।

ধর্মীয় দিক থেকে জেলাদ্বয়ের বেশির ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত। রমজান মাসে রোজা পালন, নামাজ পড়া ছাড়াও ইদ, সবেবরাত প্রভৃতি নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মীয় রীতি-নীতি এঁরা মেনে চলেন। তবে ধর্মীয় দিক থেকে এঁরা হানেফী ও শাফেয়ী এই বিশিষ্ট মতবাদকে অবলম্বন করেন।

কৃষিই এঁদের প্রধান জীবিকা। কৃষিকে কেন্দ্র করে এঁদের জীবনচর্যা অতিবাহিত হয়। তবে কৃষি ছাড়া অনেকে গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি পশুপালন করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। এঁরা খুবই পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। নারী ও পুরুষ উভয়ে সংসারের কাজ করেন। নারীরা স্বামীদের খুবই মান্য করেন। স্বামী প্রথমে না খাওয়া পর্যন্ত কোনো নারী খাবেন না। এই নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুবই কম। তবে বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। খাদ্যাভাসের দিক থেকে ডাল, ভাত, মাছ, সবজি ছাড়া চালের রুটির সঙ্গে সবজি, হালুয়া, পায়েস এঁদের প্রিয় খাদ্য। পোশাকের দিক থেকে পুরুষেরা লুঙ্গি, হাফ হাতা বা ফুলহাতা গেঞ্জি, পাঞ্জাবি পরিধান করেন। নারীরা শাড়ি, বোরখা দুটোই ব্যবহার করেন। এই মুসলিম সম্প্রদায় জেলাদ্বয়ের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে আছেন। হিন্দুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা যেমন যোগদান করেন তেমনি মুসলিমদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দুরা যোগদান করেন। এর ফলে জেলাদ্বয়ের লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম নিদর্শন।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ও একাধিক গ্রন্থ থেকে জেনেছি বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত দেশিয়া-পলিয়ারাই উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আদি বাসিন্দা। পলিয়ারা তাঁদের অনেক পরে এসেছেন। পলিয়াদের তুলনায় তাঁরা নিজেদের একটু উঁচু শ্রেণির বলে মনে করেন। তাই দেশিয়াদের কেউ পলিয়া বললে তাঁরা রেগে যান। আবার দেশিয়াদের থেকে তাঁরা যে ভিন্ন এটা পলিয়ারা স্বীকার করেন। তাই দেশিয়া-পলিয়ার মধ্যে কোন বিবাহ সম্বন্ধ হয় না। দেশিয়ারা পলিয়াদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা প্রচলিত একটি প্রবাদে পাওয়া যায় —

হাতত করি বং
তাহ নি করি পলিয়ার সং।

অর্থ ঃ হাতে লাঠি নেওয়া ভালো তবুও পলিয়ার সঙ্গ করা ভালো নয়।

অনুরূপ ভাবে পলিয়ারাও দেশিয়াদের সম্পর্কে যে সচেতন তা নিম্নোক্ত প্রবাদে জানা যায় —

দোষ করে দেশিয়া
মার খায় পলিয়া।

অর্থ ঃ দেশিয়া দোষ করে আর পলিয়া মার খায়।

তবে এইসব ধারণা থাকা সত্ত্বেও দেশিয়া-পলিয়াদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ অটুট বন্ধনে জড়িত।

(দুটি প্রবাদের তথ্যদাতা ঃ বনিরাম বর্মণ (৭০), গ্রাম - মধুপুর, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর। সুপালচন্দ্র সরকার (৬৫), গ্রাম - দেউল, থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

এই প্রাচীন জনপদে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্রবল জোয়ার থাকা সত্ত্বেও দেশিয়া-পলিয়া সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যায়নি। বলা যায় এই সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে দেশিয়া-পলিয়াদের সংস্কৃতির সমন্বয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন — লৌকিক দেবদেবী, পীর, লোকনাট্য ইত্যাদি।

রাজবংশী জাতির উৎস সম্বন্ধে যে কাহিনিটি পাওয়া যায় তা হল —

"কোচবিহারের কোচ-উপজাতিগণের এক বিরাট অংশ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত এই কোচ সম্প্রদায়ই কালক্রমে রাজবংশী নামে পরিচিত হয়; অনেকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন।

রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। পরশুরাম একবিংশবার ক্ষত্রিয়দের নিপাত করিয়াছিলেন। এই পরশুরামের ভয়েই নাকি রাজবংশীগণ নিম্নবঙ্গ হইতে পলায়ন করিয়া উত্তরবঙ্গে আত্মগোপন করে। রঙপুরের ইটাকুমারী গ্রামবাসী কবি রতিরাম দাস একটি জাগের গানে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন —

হায় রে রাজার বংশে লভিয়া জনম
পরশুরামের ভয় এ বড় সরম।
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাচি
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি।"[২৪]

এই কাহিনির ধারা অনুসারে পলিয়া সম্প্রদায়ের উৎস যে প্রায় একই ধরনের তা একাধিক পলিয়াদের মুখে শোনা যায়। গল্পটি এই রকম —

শক্তিশালী পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে লড়াই করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দেন। এর ফলে যাঁরা পালিয়ে এসে অখণ্ড দিনাজপুরে আশ্রয় নেন তাঁরা পলিয়া নামে পরিচিত।

(তথ্যদাতা ঃ সুদেব রায় (৪৮), গ্রাম - ডাঙি পাড়া,
থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

আবার বারনি সিনান (বারুনি স্নান) উপলক্ষ্যে পলিয়াদের কাছে যে লোককথাটি শোনা যায় তা এইরকম —

দোল পূর্ণিমার পর তেরো দিনের দিন কৃষ্ণপক্ষে গঙ্গারামপুর থানার শিববাড়ি নামক স্থানে পুনর্ভবা নদীতে প্রতিবছর বারনি সিনান হয়। এই বারনি সিনান উপলক্ষ্যে দেশিয়া-পলিয়ারা স্নান করতে আসে পুণ্যার্জনের জন্য। এই উপলক্ষ্যে অনেকে মানত করেন। মনস্কামনা পূরণ হলে তাঁরা গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে কলা প্রদান করেন, আবার কেউ কেউ নাপিতের দ্বারা মাথা নেড়া করেন। দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের সদ্য বিবাহিত বরবধূ এই বারুনি স্নান উপলক্ষ্যে আসবেই। বিশ্বাস বারুনি স্নানে নবদম্পতি দীর্ঘজীবী হয়। এই বারনি সিনান উপলক্ষ্যে পলিয়াদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাঁরা বারনি সিনানের আগের দিন গোরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ির উপর

টোপর লাগিয়ে সপরিবারে চাল, ডাল, তরিতরকারি এবং জ্বালানি হিসাবে শুকনো খড়ি নিয়ে যান। পঞ্জিকার নিয়ম অনুয়ায়ী স্নান সেরে ব্রাহ্মণকে কিছু দক্ষিণা দেন। এরপর নদীর এক পাশে উনুন তৈরি করে রান্নার মাধ্যমে ভোজন পর্ব সমাধা করেন। জানা যায় দেশিয়ারা এই নিয়ম পালন করেন না। তাঁরা স্নান সেরে ব্রাহ্মণ, ফকিরকে দক্ষিণা প্রদান করে দোকানে বসে খাওয়া-দাওয়া করে চলে যান। পলিয়ারা বলেন পুনর্ভবা নদীর ওপারে থাকে পলিয়া আর এপারে থাকে দেশিয়া। পলিয়াদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বাবা, মা মারা গেলে তাঁরা বারুনি স্নানের দিন মাথা নেড়া করে পর পর তিন বছর মৃত পিতা, মাতার উদ্দেশে পিণ্ড দান করেন। শোনা যায় দেশিয়াদের মধ্যে এই নিয়ম নেই।

(তথ্যদাতা ঃ সুদেব রায় (৪৮), গ্রাম - ডাঙি পাড়া,
থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

এই কাহিনি থেকে যে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ —

১. দেশিয়া-পলিয়াদের বিভাজন হিসেবে রয়েছে পুনর্ভবা নদী।
২. উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় সব থানা এলাকাতেই কমবেশি দেশিয়া-পলিয়া আছে।
৩. আসলে পুনর্ভবা নদীর ওপারে থেকেও এপারে পলিয়ারা ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।
৪. পুনর্ভবা নদী পলিয়াদের কাছে গঙ্গাতুল্য। তাঁদের বিশ্বাস এই নদীর তীরে মৃত পিতা-মাতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করলে তাঁরা স্বর্গবাসী হন।
৫. দেশিয়ারা পলিয়াদের বহুপূর্বে দিনাজপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেশিয়াদের মধ্যে যে বিভাগের সন্ধান পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা যেতে পারে —

দেশিয়া
- ছড় বা ছট্ দেশী
  - ডকই
  - ঢ্যাকড়া
  - টুনি কোচ
- বড় দেশী
  - এককড়িয়া
  - ধানুয়া
  - হাঁড়িগিল্লা

ছড় বা ছট্ দেশী ঃ

ডকই ঃ ডকইদের নিয়ে যে লোককথাটি সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ —

ডকইরা নাকি একটি পাঠা কেটেছিল। তারপর মৃত পাঠার নিতম্ব কেটে খাসি করতে গেলে সমাজের অন্য কেউ দেখে নেওয়ার ফলে তাঁদের ডকই নাম দেয়। এছাড়া জানা যায় ডকইরা চিরাকুটে বেশি এবং কথায় কথায় শালা শব্দটি প্রয়োগ করে।

(তথ্যদাতা ঃ প্রবীর সরকার (৪১), গ্রাম - মহিষবাথান,
নিমাই সরকার (৪৪), গ্রাম - দুর্গাপুর, থানা - কুশমণ্ডি,
জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

ঢ্যাকরা ঃ

ঢ্যাকরাদের কাজ হল ঘানিতে তেল তৈরি করা এবং তারিতে করে (মাটির ছোট হাঁড়ি) অনুষ্ঠান বাড়িতে সরিষার তেল পৌঁছে দেওয়া। বিবাহের সময় এঁরা পাঁচটি কলাগাছ ব্যবহার করে। জানা যায় ঢ্যাকরার সঙ্গে এক কড়িয়ার বিবাহ সম্বন্ধ হয় না।

টুনিকোচ ঃ

এঁরা মুড়ি, চিঁড়া ও গুড় দিয়ে ছোট নাড়ু তৈরি করে হাটে হাটে বিক্রি করে। এছাড়া চ্যার নাড়ু তৈরি করে। কেচোকে আঞ্চলিক ভাষায় চ্যার বা চ্যারা বলে। আটা ও ব্যাসন দিয়ে কেঁচোর মতো লম্বা ও সরু করে তেলে ভাজার পর গুড় দিয়ে ছোট ছোট নাড়ু তৈরি করে হাটে বিক্রি করে।

বড় দেশী ঃ

এককড়িয়া ঃ

এককড়িয়ার বৈশিষ্ট্য বিবাহ অনুষ্ঠানে একটি কলাগাছের ব্যবহার, এক পাঁক ঘোরা এবং কিছু সময়ের জন্য একটি কাঁঠালের পিঁড়িতে নব বরবধূ দাঁড়িয়ে থাকবে। এছাড়া মৃত ব্যক্তিকে ভালো করে ধোকরা দিয়ে মুড়ে একটি বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁরা শ্মশানে নিয়ে যায়।

ধানুয়া ঃ

যাঁরা ধান নিয়ে নানা কাজ কর্ম করেন তাঁরাই ধানুয়া। এছাড়া জানা যায় লোকসমাজে বিয়ের খরচ ধানুয়াকেই বহন করতে হয়।

হাঁড়িগিল্লা ঃ

হাঁড়িগিল্লাদের সম্পর্কে জানা যায় গ্রামের কোনো মানুষ ভয়ংকর রোগ বা কুষ্ঠব্যাধি নিয়ে মারা গেলে সমাজ সেই মৃত দেহে হাত দেয় না। তারপর সেই মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য হাঁড়িগিল্লার ডাক পড়ে। হাঁড়িগিল্লা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মুখে একটি কলাপাতায় আটা দিয়ে মৃত মানুষটিকে তৈরি করে এবং সেই সাথে আটা দিয়ে শরীরের যে অংশে ভয়ংকর রোগে মানুষটির মৃত্যু হয়েছিল তা চিহ্নিত করে সকলের সামনে ভক্ষণ করে। তারপর আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ভোজন করে। আরও জানা যায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সামনে এক হাঁড়ি দই ফেলে জিভ দিয়ে চেটে খাবে তারপর সকলে খাবে। এছাড়া দুই বা তিন বছর পর পর নাকি হাঁড়িগিল্লারা বিভিন্ন গ্রামের মহতের (সমাজের প্রধান) কাছে যায়। মহতেরা সম্মানসূচক হিসাবে হাঁড়িগিল্লাকে কিছু দক্ষিণা দেয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় পলিয়াদের মধ্যে যে বিভাগের সন্ধান পাওয়া যায় তা হল —

পলিয়া
- সাধু পলিয়া
- বাবু পলিয়া
- পানি পলিয়া
- কইচ পলিয়া
  - খাটো কইচ
  - বড় কইচ

সাধু পলিয়া ঃ

পলিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সাধু পলিয়া। সাধু পলিয়ার গলায় থাকবে তুলসীর মালা এবং শরীরে থাকে ছয়গুন পৈতা।

বাবু পলিয়া ঃ

বাবু পলিয়ার শরীরে থাকে তিনগুণ পৈতা। এঁরা বাড়িতে শূকর, মুরগী পোষে। এছাড়া বাবু পলিয়ারা শূকর খায় বলে জানা যায়।

পানি পলিয়া ঃ

ছোট নদী, পুকুর, খাল-বিলে পানি পলিয়ারা জাল, জাখই, ডিনডই দিয়ে মাছ ধরে। পানি অর্থাৎ জলের সঙ্গে এঁদের নিবিড় সম্পর্ক।

খাটো কইচ ঃ

খাটো কইচ বিয়ে বাড়ির নানান কাজকর্ম করে। যেমন এঁটো পাতা পরিষ্কার করা, উঠোন

পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

বড় কইচ ঃ

বড় কইচের কাজ হচ্ছে পালকি বহা।

সুতরাং দেশিয়া-পলিয়াদের বিভাজনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কোচেরা দেশিয়া-পলিয়ার মধ্যে মিশে গেছে। শুধুমাত্র কোচ এই নামকরণের মধ্যেই এর পরিচয় নিহিত আছে। এমন কি এঁদের পদবীও দেশিয়া-পলিয়াদের মতো। যেমন — সরকার, বর্মণ, দাস ইত্যাদি। বর্তমানে দেশিয়াদের পদবী প্রধানত সরকার, দেবশর্মা এবং পলিয়াদের পদবী বর্মণ, দাস, রায়।

দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রচণ্ড পরিশ্রমী। জমিই এঁদের মূল অবলম্বন। কৃষিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের জীবন চর্যা অতিবাহিত হয়। পুরুষেরা ভোরবেলা পান্তা ভাত খেয়ে হাল, গোরু নিয়ে কৃষিকাজে জমিবাড়ি যান। দুপুরে কিষাণীর পৌঁছে দেওয়া খাবার খেয়ে আবার হাল চালনা শুরু করেন। এই সময় হাল চালনা করতে করতে তাঁরা যে গান করেন দেশিয়া-পলিয়া সমাজে তাকে বলে হাল বহার গান। এই প্রসঙ্গে হালবহার গান —

১. হাল বাহিচু
কোদাল পারিচু
তাহ চিড়া গামছাগে
হিতি টানলে হুতি যায়
আসছ্যা চারট চাউলের গুড়াগে
খাচু ত্যা খাচু
নিখালে গুনগুনায় বেড়াচু।
এমুন কপালের নেখা
মোর কপালত নাইরে বেটা
কে যাবে মোর হালখান ধরিবা
উঠ উঠ বঁ বঁ বঁ।

(তথ্যদাতা ঃ খগেন বর্মণ (৬১), গ্রাম - লোহাগাড়া,
থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

অর্থ ঃ এক হালুয়ার বা কৃষকের জীবনের দুঃখের চিত্র ফুটে উঠেছে। হাল, কোদাল, চালনার পরেও তাঁর শরীরে ছেঁড়া গামছা। যেদিন কোন রকমে খাবার জোটে সেদিন খাওয়া হয়, না হলে ঘুরে বেড়াতে হয়। আবার এমনই তাঁর মন্দ কপাল যে তাঁর ভাগ্যে একটি ছেলেও নেই যে হাল ধরবে।

এরপর সূর্যাস্তে কৃষিকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হাল, গোরু নিয়ে কৃষক বাড়ি ফেরেন। এই হল তাঁদের কর্মমুখর জীবনযাত্রা।

জমি থেকে দেশিয়া-পলিয়াদের বাড়ি খুব কাছেই। অনেকের বাড়ি জমির পাশেই অবস্থিত। মাটির দেওয়াল, বাঁশের খুটি ও খড়ের ছাউনি বেষ্টিত ঘরগুলোতেই তাঁদের বেঁচে বেড়ে ওঠা। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে দেশিয়া-পলিয়াদের বাড়িগুলো প্রধানত দোচালা ও চারচালা বিশিষ্ট। ঘরের চারধারে মোটা পুরু মাটির দেওয়াল। মাটি থেকে ভিটে প্রায় এক থেকে দেড় ফুট উঁচু। ঘরের পরিমাপ অনুযায়ী একটি, দুটি ছোট বাঁশ কাঠির জানালা থাকে। সাধারণত ঘরের বাইরে মাটির দেওয়ালে কৃষি সরঞ্জাম ঝুলিয়ে রাখা হয়। দেশিয়া-পলিয়াদের ঘর-বাড়ি অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। নিম্নবিত্তদের সাধারণত দুটি ঘর থাকে। একটি শুতপা ঘরা (শয়ন ঘর), মাগুই ঘরা (বৈঠক ঘর)। আবার যাঁদের কিছুটা আর্থিক সামথ্য আছে তাঁদের শুতপা ঘরা (শয়ন ঘর), মাগুই ঘরা (বৈঠক ঘর), ছাড়াও গোরু ঘরা (গোয়াল ঘর), ছাগল ঘরা (ছাগল থাকার ঘর), ঢেঁকি ঘরা (ঢেঁকি ঘর), গলা ঘরা (ধানের ঘর), মইচের ঘরা (লঙ্কা রাখার ঘর) ইত্যাদি ঘর রয়েছে। উল্লেখ্য দেশিয়াদের ঘরে ঢেঁকি ও পলিয়াদের ঘরে ছামগাহিনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দেশিয়া-পলিয়ারা উভয়েই ঢেঁকি ও ছামগাহিনে ধান, চিঁড়া, বিয়ের কাশাই, হলুদ কোটেন।

নারীর অবস্থান ঃ

দেশিয়া-পলিয়া নারীরা লোকসমাজে ও পরিবারে সূর্যের আলোর মতো প্রেমপ্রীতি-স্নেহ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। লোকসমাজের চৌহদ্দীতেই এঁদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ। পুরুষ শাসিত লোকসমাজে চিরকালই নারী অবহেলিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশিয়া-পলিয়া নারীরা নানা দুঃখ, কষ্ট সহ্য করেও সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। সেই কাকভোর থেকে সংসারের কাজকর্ম করা এবং যতক্ষণ না স্বামী-সন্তান-শ্বশুর-শাশুড়ি সেবা যত্নে পরিতৃপ্ত হন ততক্ষণ সংসারের গৃহিনীর ছুটি নেই। এখানেই শেষ নয়। হাটে-বাজারে মুড়ি, চিঁড়া এবং লোকশিল্প ধোকরা বিক্রি করে এঁরা সংসারের অভাব দূর করার চেষ্টা করেন।

রোজকার এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর দেশিয়া-পলিয়া নারীরা লোকশিল্পে, বিয়ের গানে, ব্রতে, লোকপ্রবাদে, লোকাচার পালনে বিশিষ্টতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতিতে এগুলির মূল্য অপরিসীম।

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকে এই সম্প্রদায়ের নারীরা বুক থেকে জানু পর্যন্ত ঢাকা (দুখণ্ড কাপড় একসঙ্গে যুক্ত, এর আঞ্চলিক নাম ছ্যাওটা) কাপড় জড়িয়ে পরিধান করেন। আঞ্চলিক ভাষায় এই পোশাকের নাম বুকানি। তবে বাড়ির বাইরে কোথাও গেলে এঁরা শাড়ি ব্যবহার করেন। পুরুষেরা বাড়ির কাজকর্মে, কৃষিকর্মে, স্নান কার্যে নেংটি পরেন। বাড়ির বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর ব্যবহার করেন।

দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার তেমন আশানুরূপ নয়। অশিক্ষাজনিত কারণে নারীদের মধ্যে দেখা যায় নানা বিষয়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানতে পারি পরনের কাপড় বুকানি, বিছানার চাদর বিছান, সন্তানকে পিঠে বেঁধে নেওয়ার জন্য আঘুন, ধোকরা (পাটের তৈরি শতরঞ্চির মতো) নামক লোকশিল্প একমাত্র দেশিয়া নারীদের কাছ থেকে পলিয়া নারীরা এসব ক্রয় করেন। তবে পলিয়া নারীরা যে হাটে হাটে অনেকেই দই, মরিচ, হলুদ, চা বিক্রি করেন দেশিয়াদের মধ্যে প্রচলিত হুমাতানামক লোকসংগীতের মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া পলিয়া নারীদের হাটে-বাজারে দই, মরিচ, হলুদ, চা বিক্রি করাকে দেশিয়ারা যে উপহাসের চোখে দেখতেন হুমাতা লোকসংগীতে সেই চিত্রটিও ফুটে ওঠে। এই প্রসঙ্গে হুমাতা গানে উল্লেখ আছে —

১. দহি বেচি দহি বেচি
দহি ক্যানে খাটা
দহি বেচিটর সেতাংগে
কুটিখানে ফাটা।

২. মরিচ বেচি মরিচ বেচি
মরিচ ক্যানে ঝাল
মরিচ বেটিটর সেতাংগে
টাউ টাউ গাল।

৩. হলুদ বেচি হলুদ বেচি
হলুদ ক্যানে রঙ
হলুদ বেচিটর সেতাংগে
ছনডার ভেতিনা মন।

৪. চাহা বেচি চাহা বেচি
চাহা ক্যানে গরম
চাহা বেচিটর সেতাংগে
মনে মনে শরম।

(তথ্যদাতা ঃ সুরজিৎ দেবশর্মা (১৮), গ্রাম - মহিষবাথান,
শিতেল দেবশর্মা (১৭), গ্রাম - মহিষবাথান,
থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

লোকখাদ্য ঃ

লোকজীবনে দেশিয়া-পলিয়াদের অতি সাধারণ খাদ্য তালিকায় রয়েছে মোটা চালের ভাত, ঠাকরি কলাইয়ের ডাল, আলুভাজি, পটল ভাজি এবং বেগুনের তরকারি। শাকের মধ্যে নাফা ও পাটা (পাট) শাক প্রিয়। মাছের মধ্যে বোয়াল, শোল, পুঁটি, রুই, কাতল, ট্যাঙর (ট্যাংরা), কৈ, মাগুর, চান্দা ইত্যাদি প্রিয় মাছ। মাংসের মধ্যে এঁরা হাঁস, পায়রা, খাসি পছন্দ করে। এছাড়া শুকনো খাবারের মধ্যে রয়েছে মুড়ি, চিঁড়া, ছাতু এবং পিঠার মধ্যে তিলুয়া, গুড়গুড়িয়া, ভাকা ইত্যাদি পছন্দ সই খাবার খায়। মিষ্টান্নের মধ্যে মালপুয়া (ছানার জিলিপি) এঁদের প্রিয়। শিশুর ঘুমপাড়ানিবিষয়ক একটি লৌকিক ছড়ায় মালপুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় —

১. নিন্দো যা নিন্দো যা
ভাকুরের ছুয়া
তোর মা হাট গিসে
কিনে আনিবে মালপুয়া।

(তথ্যদাতা ঃ নীলা বর্মণ (৬০), গ্রাম - সোনাডাঙি,
থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

অর্থ ঃ ঘুমিয়ে পড় আদরের ছেলে। তোমার মা হাট গেছে। হাট থেকে মালপুয়া কিনে আনবে।

তবে এঁদের অতিপ্রিয় খাদ্য সিদল, সিদলের সানা, প্যালকা, অম্বল, চ্যানার ঝোল, কাকরের সানা, কাকড়ের পইট এবং গুনজরির ডাইল।

সিদল ঃ

পুঁটি, চান্দা, চপরা ইত্যাদি মাছগুলোর নাড়িভুটি বের করে হলুদ দিয়ে মেখে তিন-চারদিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকনো মাছগুলোকে ঢেঁকিতে কূটে এর সঙ্গে ডানডো কচুর পাতা মিশিয়ে পুনরায় ঢেঁকিতে কূটা হয়। তারপর ঢেঁকির গর্ত থেকে এই মিশ্রণকে বের করে সরিষার তেল দিয়ে বেশ করে মাখানো হয়। এরপর হাত দিয়ে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে চ্যাপ্টা করে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। এরই নাম সিদল। দেশিয়া-পলিয়ারা ভাতের সঙ্গে এই সিদলের স্বাদ গ্রহণ করে।

সিদলের সানা ঃ

কড়াইয়ের মধ্যে জল গরম করে সিদল ঢেলে সিদ্ধ করা হয়। এরপর সিদ্ধ সিদলের সঙ্গে রসুন, পিঁয়াজ, লঙ্কা, সরিষার তেল, লবণ দিয়ে বেশ করে মেখে তৈরি হয় সিদলের সানা। দেশিয়া-পলিয়ারা পান্তা ভাতের সঙ্গে সিদলের সানা খায়।

প্যালকা ঃ

জমি থেকে পাট শাক তুলে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়। এরপর কড়াইয়ে গরম জলে পাটশাক সিদ্ধ করে পরিমাণ মত লবণ, সরিষার তেল, হলুদ, রসুন, পিঁয়াজ দিয়ে রান্না করে তৈরি হয় প্যালকা।

অম্বল ঃ

কচি আম লম্বা লম্বা করে কেটে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। রোদে শুকিয়ে যাওয়ার পর আমের এই লম্বা টুকরো অংশকে দেশিয়া-পলিয়া সমাজে বলে আমের চুনা। প্যালকার সঙ্গে আমের চুনা মিশিয়ে তৈরি হয় অম্বল।

চ্যানার ঝোল ঃ

চুনিয়া কুমরা (সাদা কুমরো) ছোট ছোট টুকরো করে তার মধ্যে সুইসুতো দিয়ে গেঁথে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকিয়ে যাওয়া চুনিয়া কুমরার ছোট ছোট টুকরোগুলোকে আঞ্চলিক ভাষায় চ্যানা বলে। মাছ, মাংস এবং আলুর ঝোলে এই চ্যানা মিশিয়ে দিলে তাকে বলে চ্যানার ঝোল।

কাকড়ের সানা ঃ

দেশিয়া-পলিয়া লোকসমাজের মতে কাকড় (কাকড়া) তিন প্রকার। যথা —

ক. জাঙ্গুয়া কাকড় - এই কাকড় গর্তের মধ্যে থাকে।

খ. থেপি কাকড় - এই কাকড়কে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে খাল-বিলের মধ্যে পাওয়া যায়।

গ. খইরী কাকড় - এই কাকড় বালি মাটিতে থাকে।

দেশিয়া-পলিয়ারা জাঙ্গুয়া কাকড়কে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। কারণ এই কাকড় গর্তের মধ্যে থাকে বলে তার স্বাদ অতুলনীয়। প্রথমে কাকড়াকে গরম জলে সিদ্ধ করে নেওয়ার পর পিঠের অংশকে বাদ দিয়ে এর সঙ্গে রসুন সিদ্ধ মিশ্রণ করে শিলপাটাতে ভালো করে পিষে নিয়ে তাতে পরিমাণ মত লবণ, সরিষার তেল মিশিয়ে তৈরি হয় কাকড়ের সানা।

কাকড়ের পইট ঃ

প্রথমে একাধিক কাকড়াকে ভালো করে শিলপাটায় পেষাই করা হয়। এরপর ছাকনি দিয়ে ছেকে যে ঘন রস বের হয় তার সঙ্গে পরিমাণ মতো লবণ, সরিষার তেল মিশিয়ে ভালো করে পরিপাকের মাধ্যমে আরো ঘন করা হয়। এই লবণ, সরিষার তেল মিশ্রিত ঘন রসকে বলা হয় কাকড়ের পইট।

গুনজরির ডাইল ঃ

গ্রামের নদী-নালা, খাল-বিলে একধরনের ছোট ছোট শামুক পাওয়া যায়। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে গুনজরি। প্রথমে শামুকগুলোকে জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ধারালো ছুরি দিয়ে পেছনের অংশ কেটে গরম জলে সিদ্ধ করে ডালের মতো রান্না করা হয়। একেই বলে গুনজরির ডাইল। ভাতের সঙ্গে এই গুনজরির ডাইল খাওয়া হয়।

ভাত, ডাল, শাক, মাছ, মাংস, মুড়ি, চিঁড়া শুধুমাত্র দেশিয়া-পলিয়া লোকসমাজে নয়, সমস্ত বাঙালিরই এগুলো প্রধান খাদ্য। কিন্তু দেশিয়া-পলিয়া লোকসমাজের প্রধান লোকখাদ্য সিদল, সিদলের সানা, প্যালকা, অম্বল, চ্যানার ঝোল, কাকড়ের সানা, কাকড়ের পইট এবং গুনজরির ডাইল। দরিদ্র ঘরের দেশিয়া-পলিয়া নারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবারের জন্য এই লোকখাদ্য গুলো প্রস্তুত করে। বিশ্বায়নে এই লোকখাদ্যগুলো এখনো হারিয়ে যায়নি। দরিদ্র ঘরের দেশিয়া-পলিয়ারা আনন্দের সাথেই এগুলো আহার করে।

চৈত্র সংক্রান্তি ঃ

দেশিয়া-পলিয়া সমাজে চৈত্র সংক্রান্তিতে জাল, জাখই, পোলই দিয়ে মাছ ধরা হয়। এই লোকসমাজ মনে করে এই দিনে মাছ ধরলেই সাইত (শুভ)। এই দিন কিশোর, যুবকেরা বাটুল দিয়ে বক, ঘুঘু শিকার করে। এক সময় তীর ধনুক দিয়ে শিয়াল মারা হত। শিয়াল মারাকে এই সমাজ বীরত্ব হিসেবে মনে করে। মৃত শিয়ালকে যুবকেরা কখনই লোকসমাজে নিয়ে আসে না। আসলে লোকসমাজে শিয়াল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ক্রোধের জন্তু। একটা সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চল ঘনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। শিয়ালের দাপট ছিল ভয়ংকর। নির্জনতা ও বিদ্যুতের আলোর অভাবের সুযোগ নিয়ে শিয়ালের লোলুপ দৃষ্টি লোকজীবনে শিশুর উপর বর্ষিত হত। তাই শিয়াল শিকারের পর যুবকেরা বুনো বিড়ালের শিকার করে। শিয়াল ও বুনো বিড়াল লোকসমাজে গভীর তাৎপর্য বহন করে। তাই আজও লোকসমাজে দেশিয়া-পলিয়া মায়েরা শিশুদের শিয়াল ও বুনো বিড়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে ঘুমপাড়ানি বিষয়ক লৌকিক ছড়ায় বলা হয়েছে —

১. নিনদারে ছুয়া, নিনদারে ছুয়া
শিয়াল আসিবে
ভমা বিলাই ট শুনা পালে
খামচায় লিবে।
নিনদারে ছুয়া, নিনদারে ছুয়া।

(তথ্যদাতা ঃ প্রমিলা বর্মণ (৪৫), গ্রাম - সোনাডাঙি,
থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

দেশিয়া-পলিয়া জনগণের যদি কোনো ধার দেনা থাকে তাহলে তাঁরা চৈত্রসংক্রান্তির আগেই মিটিয়ে দিবে। এই দিনে কোনো ঋণ শোধ করবে না। কারণ সারাবছর যেন ধারদেনা না

থাকে। এই দিন তাঁদের ছাতু খাওয়া নিয়মের মধ্যে পড়ে। এছাড়া এই দিনে রান্না করা ভাতে তাঁরা জল ঢেলে দিয়ে পরের দিন পয়লা বৈশাখে খাবে। কারণ সারাবছর যেন তাঁরা ভাত খেতে পারে।

চৈত্রসংক্রান্তির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, এই দিনে দেশিয়া-পলিয়া সমাজ নিমপাতা, কাঁচা রসুন সহ গাছ, পেঁয়াজ সহ গাছ এবং ছোট ছোট আম একসঙ্গে বেঁধে ঘরের চালে ঝুলিয়ে দেয়। আসলে এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঔষধি গুণ। লোকসমাজে এবং পরিবারে এগুলো লোকঔষধের কাজ করে। লোকসমাজের বিশ্বাস চৈত্র মাসে, বৈশাখ মাসে বসন্ত রোগের ভাইরাস রোধে এটি প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

ভূতের ভয় ঃ

মাশান আঞ্চলিক অপদেবতা, বিদেহী ও হাওয়ারূপী। দেশিয়া-পলিয়া লোকসমাজে এর পরিচিত নাম ভূত। লোকসমাজে ভূতের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। লোকসমাজের বেশির ভাগ লোকের কাছে ভূত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উত্তর ভেসে আসে - মুই জান্ গ্যালাও নি কহিম (মরে গেলেও বলব না)।

ভূতের ভয় তাঁদের মধ্যে যে রয়েছে এই উক্তিই প্রমাণ দিয়ে যায়। তবে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। লোকসমাজের বিশ্বাস ভূত থাকে বাঁশঝাড়, শিমুল, তাল, খাল-বিল, শ্মশান ইত্যাদি জায়গায়। এই ভৌতিকস্থানগুলো লোকালয়ের খুব দূরে নয়। সুতরাং তাঁদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় ভূতের ভয় থাকাটাই স্বাভাবিক।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার খুনিয়াডাঙি, মহিষবাথান, সহ আশপাশের গ্রামে এক ভয়ংকর লৌকিক দেবী ফাঁসকালী অদৃশ্য শক্তিরূপে বিরাজ করে। এই স্থানের লোকের বিশ্বাস এই দেবী থাকে বাঁশঝাড়ে। এই কালী যাঁকে ধরে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাঁদের মতে সময় মতো ওঝার ডাক না পড়লে বিপদ হতে বাধ্য।

উত্তর দিনাজপুর জেলার লোকসমাজে এইরূপ যে পাঁচরকম ভূতের নাম পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা যেতে পারে —

ক. সোরভূতা ঃ

সোর অর্থ শূকর। এই ভূতের বাস কালিয়াগঞ্জ থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। শূকর রূপে মানুষকে ধরে। যাঁকে ধরবে সে শূকরের মতো শব্দ করবে।

খ. নিমাতিয়া ভূতা ঃ

এই ভূতের অবস্থান কালিয়াগঞ্জ থানার ধনকুলতলা গ্রামে। শিমুল গাছে থাকে। মাথা না থাকার ফলে এর নাম নিমাতিয়া ভূতা।

গ. সাতালনি ভূতা ঃ

কালিয়াগঞ্জ থানার মির্জাপুর গ্রামের বুড়ি পুকুরের ধারে এই ভূত থাকে। ভয়ংকর ভূত। ঘন কালো সাঁওতালির রূপ ধরে মানুষকে ধরে।

ঘ. বিলাই ভূতা ঃ

লক্ষ্মীপুর গ্রামে থাকে। রাত্রে কেউ একাকী বের হলে বিড়ালের রূপ ধরে তাঁর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবে। যাঁকে ধরবে সে বিড়ালের মতো শব্দ করবে।

ঙ. চারভূতা ঃ

স্থান লক্ষ্মীপুর। বিশাল আকৃতির এই ভূত রাত্রে চার হাত, পা ছড়িয়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছে পা রাখে। ফাঁক দিয়ে কোন মানুষ গেলে তাঁকে ধরে ফেলে।

লোকসমাজের মতে ভূতে ধরা লোকের শরীর ও মনের নানা পরিবর্তন ঘটে। শরীর শুকিয়ে যাবে, দেহে কম্পন হবে, হাত, পা অবশ হয়ে যাবে, ঘুমন্ত অবস্থায় চমকে উঠবে, দাঁতে দাঁত ঘষে এক প্রকার বিকৃত শব্দ করবে, চোখ লাল হবে, হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে আবার চলে আসবে এবং কেউ কেউ বাঁশঝাড়, শিমূল গাছে লুকিয়ে থাকবে। এরপর লোকসমাজের বুদ্ধি বিচারে ভূতের আক্রমণ থেকে সেই লোকটিকে রক্ষা করার জন্যে ওঝা বা মাহানের ডাক পড়ে। ওঝা বিন্দুমাত্র দেরী না করে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। এরপর ওঝা লোকটির শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ অনুযায়ী জলে তুলসীপাতা স্পর্শ করে রোগীর শরীরে ছিটিয়ে ঝাঁড়ফুক করে। এ বিষয়ে ভূতের মন্ত্র —

১. কানদে ভূতের মাউ
কানদে পিশাচের মাউ
হায় বাছা বলিয়া রে
ও ভূতের হাড় চদু, নার চদু

বতিশ পানজার চদু

নুনুখুয়া তালুকা চদু

হায় বাছা বলিয়া রে

ফুত .... ।

(তথ্যদাতা ঃ সদরু বমর্ণ (৭০), গ্রাম - লক্ষ্মীপুর,

থানা - কালিয়াগঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

এই ভূতকেন্দ্রিক মন্ত্রগুলোর ওঝা বা মাহানেরাই ধারক ও বাহক। ভূতে ধরলে লোকসমাজের মানুষ ওঝার কাছে উপস্থিত হয়। লোক-বিশ্বাস এক বিশেষ ক্ষমতা বলে ওঝারা ভূতের কুপ্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। ওঝারাও মনে করেন ভূতের উদ্দেশে মন্ত্র প্রয়োগ না করলে নারী বা পুরুষকে ভূত সহজে ছেড়ে যেতে চায় না। ওঝা যখন জলে তুলসী পাতা স্পর্শ করে রোগীর দেহে সেই জল ছিটিয়ে দেয় সেটা যেমন ঔষধের কাজ করে তেমনি ওঝা সুর সহযোগে যে রোগীর সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করে তা মিউজিক থেরাপির কাজ করে। ফলে রোগীর সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট সাহায্য করে।

ধর্মীয় পরিচয় ঃ

ধর্মীয় দিক থেকে দেশিয়া-পলিয়ারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত। এঁরা খুবই ধর্মভীরু। কারণ লোকনাট্যের বন্দনায়, মাঘী -ব বা ধরম ব্রতে, লৌকিক দেবী বুড়ি বাশুলিকেন্দ্রিক মন্ত্রে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে অনেক পুঁথিপত্র সন্ধান করেন। সেই সন্ধানের ফলে ধর্মমঙ্গল, ধর্মঠাকুরের ছড়া, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি পুঁথি আবিষ্কৃত হতে থাকে। শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে ধর্মঠাকুরের পরিচয় ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখলেন বাংলাদেশের ডোম ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা মহাসমারোহে হয়ে থাকে। কোন কোন সময়ে এতে উচ্চ বর্ণেরাও অল্প স্বল্প যোগ দিয়ে থাকেন। হরপ্রসাদ অনুমান করেন যে, এই ধর্মঠাকুর হচ্ছেন বৌদ্ধধর্মেরই প্রচ্ছন্নরূপ।"[২৫]

জেলাদ্বয়ে প্রচলিত লোকনাট্যের বন্দনায় ধর্মঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে। যেমন —

১. পুরুবে বন্দনা করি

ধর্মঠাকুরের চরণ বন্দি

ধর্মঠাকুরের ছিরিচরণে জানাই পরনাম।

পশ্চিমে বন্দনা করি
পীর সাহেবের চরণবন্দি
পীর সাহেবের ছিরিচরণে জানাই পরনাম।
উত্তরে বন্দনা করি
দুর্গা মায়ের চরণবন্দি
দুর্গামায়ের ছিরি চরণে জানাই পরনাম।
দক্ষিণে বন্দনা করি
গঙ্গামায়ের চরণ বন্দি
গঙ্গামায়ের ছিরি চরণে জানাই পরনাম।
আসরে বন্দনা করি
দশঠাকুরের চরণবন্দি
দশঠাকুরের ছিরি চরণে জানাই পরনাম।
শুন শুন এমরা দশ ঝন
এই আসরে গাউনা হবে
আধিয়ার বিদ্রোহ তেভাগা আন্দোলন।

(তথ্যদাতা ঃ খুশি সরকার (৫৪), গ্রাম - উষাহরণ,
থানা - কুশমণ্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর।)

মাঘ মাসের তৃতীয় রবিবার দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায় সূর্যাস্তে বা গোধূলি লগ্নে চাষের জমিতে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে মানুষের দেহের মতো আল তৈরি করে তাতে লেপামুছা ও আলপনা সহ যে ব্রত করেন তার নাম ধরম -ব।

এছাড়া জেলাদ্বয়ে পূজিত লৌকিক দেবী বুড়ি বাশুলিকেন্দ্রিক মন্ত্রেও ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে লক্ষ্য করা যায় প্রথমে ধর্মঠাকুরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তারপরে অনুরূপ নিবেদন করা হয়েছে দেবী বাশুলির প্রতি। মন্ত্রটি নিম্নরূপ —

১. শানদিল গে, শানবিনে মোর
বাঙেলা আনধার
এ পরথমবারে শানদিল বাতি ট মোর
গাঁয়ের ধরম ঠাকুর পায়
তারপর না শানদিল বাতি ট মোর

বুড়ি বাশুলি পায়।

শব্দার্থ ঃ শানদিল বাতি - সন্ধ্যা প্রদীপ, আনধার - অন্ধকার।

(তথ্যদাতা ঃ বনিরাম বর্মণ (৭০), গ্রাম - মধুপুর,
থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর।)

জেলাদ্বয়ের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী রয়েছে। এই লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে পুরুষ দেবতার তুলনায় মাতৃ দেবতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এই বিষয়কে সামনে রেখে বলা যায় দেশিয়া-পলিয়াদের প্রাচীন সমাজ যেমন ছিল মাতৃতান্ত্রিক তেমনি তাঁদের ধর্মীয় কাঠামো গড়ে উঠেছিল মাতৃকা উপাসনাকে কেন্দ্র করে। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের সকলে এই লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনায় মেতে ওঠে। এছাড়া বিভিন্ন মাঙ্গলিক কর্মে লৌকিক দেবদেবীদের থানে গিয়ে এঁরা পুজো দিয়ে থাকে। কারণ তাঁদের বিশ্বাস পুজো না করলে অমঙ্গল হয়। এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে — "প্রাচীনতম সমাজ ছিল মূলতঃ মাতৃকেন্দ্রিক; বিধিবদ্ধ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক তখনও মানুষ তৈরি করতে শেখেনি বলে একমাত্র মাতৃ-পরিচয়ই ছিল সে-সময়ে সুনির্দিষ্ট এবং পিতৃপরিচয়ের অনিশ্চিতির ফলে আদিমতম যে - সামাজিক ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, তার মূল রূপটা ছিল মাতৃকা-উপাসনা।"[২৬]

তুলসীগাছকে দেশিয়া-পলিয়ারা ঈশ্বর জ্ঞানে পুজো করে। প্রতিদিন স্নান সেরে তুলসী গাছে জল ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়া তাঁদের আবশ্যিক কর্তব্য। দেশিয়া-পলিয়াদের কাছে বৈশাখ মাস ধর্ম মাস। এই মাসে কেউ আমিষ আহার করে না। এই মাসে তুলসী গাছের দুই পাশে দুটি বাঁশের বাতা পুঁতে দিয়ে তাঁরা মাঝখানে দড়ি দিয়ে মাটির হাঁড়ি বেঁধে তুলসী গাছের উপর ঝুলিয়ে দেয়। মাটির হাঁড়ির নিচে ফুটো করে হাঁড়ির মধ্যে দূর্বা দিয়ে জল ঢেলে দেয়। এরপর মাটির হাঁড়ি থেকে টপ টপ করে জল তুলসী গাছের ওপর পড়ে। একে বলে জাগরণ। আসলে বৈশাখ মাসের প্রখর রোদে তুলসী গাছ যেন শুকিয়ে না যায় তার জন্য এ বিধি ব্যবস্থা। এই নিয়ম ভঙ্গ হবে বৈশাখ সংক্রান্তিতে স্নানের আগে বাঁশের বাতা সহ মাটির হাঁড়ি আশপাশের পুকুড়ে বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এরপর সন্ধ্যা বেলায় তুলসী বেদীর সামনে নামকীর্তন সহ পুজো করা হয়।

দেশিয়া-পলিয়াদের বাড়িতে যে তুলসী বেদী রয়েছে তার বিভিন্ন নামকরণ আছে।

বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে এই নামকরণকে দুটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। আদিস্তরে কৃষ্ণ ও বলরাম। মধ্যস্তরে জগমোহন (চৈতন্য), নিতানন, আমাত, অদ্বৈত এগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে লক্ষ্য করে দেখা যায় দেশিয়াদের বাড়িতে জগমোহন (চৈতন্য) এবং পলিয়াদের বাড়িতে নিতানন (নিত্যানন্দ) এর সংখ্যাটাই বেশি। এর থেকে অনুমান করা যায় বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে দেশিয়া-পলিয়াদের ধর্মীয় জীবনে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তবে শিব, কালী, বিষহরা, গ্রামঠাকুর ইত্যাদি দেবদেবীকে কিন্তু এঁরা কেউ অস্বীকার করে না। বরং এইসব দেবদেবীকে তাঁরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পুজো করে।

পীর হচ্ছে ধর্ম সমন্বয়ের ভিত্তি ভূমি। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে অজস্র পীরের থান রয়েছে। দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায় এই পীরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কারণ তাঁদের চিন্তন প্রক্রিয়ায় পীর সম্পর্কিত যে প্রবাদ রয়েছে তা হল —

পীরের মার ধীর্যা

এমনকি এই জেলাদ্বয়ে বহু পীরের সেবায়েত দেশিয়া-পলিয়া সম্প্রদায়। বছরের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে পীর পুজোয় হিন্দু-মুসলিম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সন্তান কামনায়, আধি-ব্যাধি থেকে মুক্ত এবং পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য ভক্তেরা পীরের কাছে মানত করে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে ভক্তেরা মানত প্রদান করেন এবং পীরস্থানের মাটি মাথায় দেন। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে পীরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে বলা যেতে পারে লোকসংস্কৃতি, লোকধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে লোকসমাজের মূল শিকড় নিহিত।

তথ্যসূত্র ঃ

১. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Uttar Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 1.

২. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Dakshin Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 1.

৩. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Uttar Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 10.

৪. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Dakshin Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 10.

৫. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী, ১৩৯৫, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ৭-৯।

৬. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী, ১৩৯৫, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ,পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ৯-১০।

৭. F.W. Strong - Eastern Bengal District Gazetteers Dinajpur, Allahabad, The pioneer Press, 1912, p. 1.

৮. রজনীকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদনা: ড. মলয় শঙ্কর ভট্টাচার্য - গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৩০৫।

৯. ধনঞ্জয় রায় - দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা - ৭০০০১২, পৃ. ১।

১০. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী, ১৩৯৫, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ১৪-১৫।

১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস, দশম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স

প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৭০০০১৩, পৃ. ৭৩।

১২. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, ১৩৯৫, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ১৯।

১৩. Edited by Jatindra Chandra Sengupta - West Bengal District Gazetteers, April 1965, West Dinajpur, Government of West Bengal, p. 41-47.

১৪. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Uttar Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 29.

১৫. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Dakshin Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 29.

১৬. Cencus of India - 1971 : District cencus Hand Book, SERIES - 22, Part X-C, West Dinajpur District, West Bengal, p. 288-290.

১৭. Ibid, p. 318.

১৮. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Uttar Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 28.

১৯. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Dakshin Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 28.

২০. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Uttar Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 11,14.

২১. District Statistical Hand Book - Bureau of Applied Economics and Statistics, Dakshin Dinajpur, Govt. of West Bengal, 2005, p. 11, 14.

২২. S.F. Nadel - The Foundations of Social Anthropology, Second Impression, 1953, Cohen & West Ltd, London, p. 2.

২৩. কার্ত্তিকচন্দ্র শাসমল - সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯৯, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৭০০০০৬, পৃ. ১১১।

২৪. নির্মলেন্দু ভৌমিক - প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৮৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, কলিকাতা - ৯, পৃ. ১।

২৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, দশম পরিবর্ধিত সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, কলিকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ১৪৩।

২৬. পল্লব সেনগুপ্ত - পূজা-পার্বণের উৎস কথা, তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, মে ২০০১, কলিকাতা - ৯, পৃ. ৩৯।

________****________